তুলি-কলম

রবীন্দ্রকবিতায় বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি

সঙ্ঘমিত্রা সুর চৌধুরী

পরমকরুণাময় তথাগত বুদ্ধের আদর্শ ও বৌদ্ধ সাহিত্যের বিশ্বজনীনতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। রবীন্দ্রচিত্তের গঠন ও পরিপোষণে বৌদ্ধ সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি সুনির্দিষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ কাহিনির প্রতি কবিচিত্তের এই অনন্যসাধারণ প্রবণতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এক প্রবন্ধে বলেছেন,

''... এক সময়ে আমি যখন বৌদ্ধ কাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ করে আমার মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ 'কথা ও কাহিনী'র গল্পধারা উৎসের মতো নানা শাখায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ... এই 'কথা ও কাহিনী'র রূপ ও রস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দের আন্দোলন তুলেছিল, ইতিহাস তার কারণ নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মাই তার কারণ।... দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি তার পূর্বে এবং তার পরে এ-সকল চিত্র ঠিক এমন করে দেখতে পায় নি। বস্তুত, তারা আনন্দ পেয়েছে, এই কারণে, কবির এই সৃষ্টিকর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্য থেকে।''[১]

ভারত-ইতিহাসে উপনিষদের যুগ এবং শিখ-মারাঠি অভ্যুত্থানের যুগের মতো বৌদ্ধ যুগও যে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যেই তার সুস্পষ্ট পরিচয় বর্তমান। রবীন্দ্রপ্রতিভা যখনই শ্রদ্ধা-প্রীতি ও বিস্ময়ভরে কোনও বৌদ্ধ কাহিনির কাব্যরূপ দান করেছে, তখনই বর্ণনীয় বিষয় ও নায়ক-নায়িকার সঙ্গে কবি একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। বৌদ্ধ সাহিত্য বা শাস্ত্রের যেটুকু প্রত্যক্ষ উপকরণ রবীন্দ্ররচনায় দেখা যায় তার মধ্যে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' (১৮৮২) গ্রন্থটিই প্রধান। গ্রন্থখানি যে রবীন্দ্রনাথের নিত্যসঙ্গী ছিল, প্রথম জীবনে ইন্দিরা দেবীকে লেখা এক পত্রে তার পরিচয় মেলে :

''...মফস্বলে যখন যাই তখন অনেকগুলো বই সঙ্গে নিতে হয়!... কখন কোন্‌টা দরকার বোধ হবে আগে থাকতে জানবার জো নেই... সেই জন্যে আমার সঙ্গে 'নেপালীজ বুদ্ধিস্টিক লিটারেচর' থেকে আরম্ভ করে সেক্‌স্‌পীয়র পর্যন্ত কত রকমেরই যে বই আছে তার আর ঠিকানা নেই।''[২]

এই গ্রন্থখানির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন অসংখ্য কবিতা ও নাটকের উপাদান। কবিদৃষ্টির সম্মুখে উন্মোচিত হল একটি সম্পূর্ণ নতুন কাব্যজগৎ। গ্রন্থবর্ণিত বৌদ্ধ কাহিনি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, মস্তকবিক্রয়,

পূজারিনী, নগরলক্ষ্মী, পরিশোধ, সামান্য ক্ষতি, মূল্যপ্রাপ্তি, অভিসার—এই কবিতাগুলি পড়লেই বোঝা যায় বৌদ্ধ কাহিনিগুলি রবীন্দ্রনাথের মনে কী গভীর প্রভাব ফেলেছিল। রূপবৈচিত্র্যে ও ভাবগভীরতায় কবির বৌদ্ধ আখ্যানমূলক রচনাগুলি যে-জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তার তুলনা বিরল। শুধু রূপ ও রসের দিক থেকে নয়, ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার দিক থেকেও এই রচনাগুলির বিশেষ সার্থকতা আছে। কবিতাগুলিতে বৌদ্ধ যুগ ও বৌদ্ধ ভাবধারার পরিচয়টি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বৌদ্ধ ধর্মের স্পর্শে ভারতবর্ষের চিত্ত-সরোবরে ত্যাগে-প্রেমে-সেবায় ও ভক্তিতে যে অমৃত-শতদল প্রস্ফুটিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ সুনিপুণ মালাকারের মতো তা এখানে নতুন করে চয়ন করেছেন। কবি তাঁর কাব্যের উপাদান অনেকাংশে প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস থেকে আহরণ করে থাকেন, এ চিরন্তন সত্য। কিন্তু একই উপাদান বিভিন্ন কবিপ্রতিভার স্পর্শে রূপান্তরিত হয়ে কবির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। কবিতার জন্ম হয় কবিসত্তার যে-গভীর রহস্যমূল থেকে, সেখানে কবিতার প্রভাব, চিন্তার প্রভাব, দর্শনের প্রভাব একাকার হয়ে থাকে কবির আপন স্পন্দিত জীবনবোধের মধ্যে। কবিমাত্রই তাই মৌলিক—বিষয়বস্তুর অভূতপূর্বতায় নয়, রূপসৃষ্টির আত্মতায়।

'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' কবিতায় কবি মূল বৌদ্ধ কাহিনিকে প্রায় যথাযথ অনুসরণ করেছেন। প্রভু বুদ্ধের নামে ভিক্ষাপ্রার্থী অনাথপিণ্ডদ শ্রাবস্তীপুরীর 'গগনলগন' প্রাসাদশ্রেণি অতিক্রম করে চলেছেন। ধনী পুরবাসীর দেওয়া মুঠি মুঠি রত্নমাণিক্যের প্রতি তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। পৌরজনের কাছে তাঁর আবেদন :

''ওগো পৌরজন, করো অবধান,
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ তিনি বুদ্ধ ভগবান,
দেহো তাঁরে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দান
যতনে।''

অবশেষে মহানগরীর সীমা পার হয়ে বনের প্রান্তে এসে দীন নারীর ছিন্ন বসনকে তিনি শ্রেষ্ঠদান হিসাবে মাথায় তুলে নিলেন।

বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে ত্যাগের আদর্শকে খুব বড় করে দেখানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় এই আদর্শকেই অসাধারণ মহিমায় পরিস্ফুট করেছেন। বুদ্ধশিষ্য অনাথপিণ্ডদ তাই 'অম্বুদ নিনাদে' শ্রাবস্তীপুরবাসীকে বলেছেন,

''মেঘ বরিষার
নিজেরে নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার,
সব ধর্মমাঝে ত্যাগধর্ম সার
ভুবনে।''

তাই তাঁর কাছে অখ্যাত দীন নারীর জীর্ণ, ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড ধনরত্নের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। সেই 'ছিন্ন চীরখানি' মাথায় নিয়ে নগর ছেড়ে তিনি চলেন 'বুদ্ধের চরণনখর-আলোকে' সেটি সমর্পণের উদ্দেশ্যে।

বৌদ্ধ যুগের আর এক মহনীয় আত্মত্যাগের আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে 'মস্তকবিক্রয়' কবিতায়। এখানে দেখা যায়, ঈর্ষাপরায়ণ কাশীরাজের কাছে পরাজিত হয়ে দীনের প্রতিপালক কোশলরাজ বনের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাশীরাজ নগরের চতুর্দিকে ঘোষণা করে দেন :

''যে ধরি আনি দিবে কোশলরাজে
কনক শত দিব তারে।''

সর্বহারা এক বণিক তার দুঃখের কাহিনি জানালে বনবাসী কোশলরাজ নিজ শিরের বিনিময়ে বণিকের অর্থাগমের জন্য কাশীরাজের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ''আমার ধরা পেলে যা দিবে পণ
দেহো তা মোর সাথিটিরে।''

একথা শুনে সভার লোক চমকে উঠল, গৃহতল হল নীরব। এমনকী

''বর্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে
অশ্রু করে ছলছল।''

জ্ঞানপ্রাপ্ত কাশীরাজের পরিবর্তন কবি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ঈর্ষাপরায়ণ কাশীরাজ দীনের বন্ধু কোশলরাজ কর্তৃক মানবমহিমার পরম সত্যকে নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করে কোশলরাজকে উদ্দেশ করে বলে উঠেছেন :

"... ওহে বন্দী,
মরিয়া হবে জয়ী আমার 'পরে
এমনি করিয়াছ ফন্দি!
তোমার সে আশায় হানিব বাজ,
জিনিব আজিকার রণে—
রাজ্য ফিরি দিব হে মহারাজ,
হৃদয় দিব তারি সনে।"

আত্মত্যাগের মহান আদর্শ এবং সেই আদর্শে অপরের হৃদয় পরিবর্তনের যে-মহান চিত্র এই কবিতায় কবি ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। কাহিনিগত দিক থেকে কবিতাটি বৌদ্ধ 'মহাবস্ত্ববদানে'র কাহিনির প্রায় হুবহু অনুসৃতি হলেও কবির প্রতিভা ও বিশিষ্ট জীবনদর্শনের আলোকস্পর্শে কবিতাটি নবমহিমায় উদ্ভাসিত।

'পূজারিনী' কবিতাটি 'নটীর পূজা' নাটিকার পূর্বতন রূপ। অবদান শতকের শ্রীমতী-অবদানের কাহিনি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি রচনা করেন। 'পূজারিনী' কবিতা ও 'নটীর পূজা' নাটিকার রচনাকালের ব্যবধান দেখলে বোঝা যায় এই বৌদ্ধ কাহিনির প্রতি কবির কত গভীর অনুরাগ ছিল এবং কত দীর্ঘ দিন ধরে তা কবির মনকে অধিকার করে ছিল। 'পূজারিনী'তে ভক্তহৃদয়ের এক উদার ও উজ্জ্বল দিকের পরিচয় ফুটে উঠেছে। এক সামান্য নারী গুরুর জন্য সম্রাটের আদেশকে অবহেলা করতে দ্বিধাবোধ করেনি। নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও সে আদর্শকে বজায় রেখেছে। পূজারিনী ও ভক্ত-সাধিকা শ্রীমতী চরিত্র অঙ্কনে কবি অসাধারণ কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। পূজার্ঘ্য নিবেদনের জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করার প্রেরণায় শ্রীমতীর আন্তরিক আগ্রহ ও নীরব-নম্র ভাবটি কবি গভীর মমতায় উন্মোচিত করেছেন :

"সেদিন শারদ-দিবা অবসান—
শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া,
পুষ্পপ্রদীপ থালায় বাহিয়া,
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
নীরবে দাঁড়ালো আসি।"

দেশের জন্য কিংবা বিশেষ আদর্শের জন্য বীরের আত্মদানের কাহিনি ইতিহাসে অনেক কাছে। কিন্তু পূজার আবেগে নারীর আত্মবিসর্জনের দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের চিত্রটি শ্রীমতীকে অবলম্বন করে এক নিগূঢ় ব্যঞ্জনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'পূজারিনী' কবিতায় বুদ্ধের বেদিমূলে শ্রীমতীর আত্মদান একটি সাধারণ ত্যাগের কাহিনিরূপে বর্ণিত হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ সাতাশ বছর পরে 'নটীর পূজা'য় তা নিগূঢ় অর্থে ও তাৎপর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই নাটিকার বক্তব্য ব্যাখ্যা করে কবি লিখেছেন :

"বুদ্ধদেবকে নটী যে অর্ঘ্য দান করতে চেয়েছিল সে তার নৃত্য। অন্য সাধকেরা তাঁকে দিয়েছিল যা ছিল তাদেরই অন্তরতর সত্য, নটী দিয়েছে তার সমস্ত জীবনের অভিব্যক্ত সত্যকে। মৃত্যু দিয়ে সেই সত্যের চরম মূল্য প্রমাণ করেছে। এই নৃত্যকে পরিপূর্ণ করে জাগিয়ে তুলেছিল তার প্রাণমনের মধ্যে তার প্রাণের প্রাণ।"[৩]

এই গভীর জীবনদর্শনের বাণী রবীন্দ্রনাথের পরিণত মনের ফসল এবং একান্তভাবেই নিজস্ব।

'নগরলক্ষ্মী' কবিতায় দেখা যায়, সমৃদ্ধ শ্রাবস্তী নগরী প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে। ভগবান বুদ্ধ ক্ষুধিতদের অন্নদানের জন্য প্রত্যেক পুরবাসীর কাছে জনে জনে আবেদন জানালেন। ধনী-মানী যাঁরা ছিলেন সকলেই ক্ষুধার্ত বিশাল পুরীর ক্ষুধা মেটাবার

ব্যাপারে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে নীরবে মাথা নত করলেন। এই বিষয়টি কবির অপূর্ব সৃষ্টিকুশলতায় এক অসাধারণ চিত্ররূপে পরিস্ফুট হয়েছে—

''নির্বাক্ সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী-'পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি।''

তখন 'বেদনায় অশ্রুপ্লুতা' ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া বুদ্ধদেবের চরণধূলি নিয়ে জানালেন, তিনি এই দুর্ভিক্ষপীড়িত নগরীতে অন্ন বিতরণের ভার গ্রহণ করবেন। খাদ্যহারা সব বুভুক্ষু মানুষ তাঁরই সন্তান। ভিক্ষুণী হয়ে কোন সাহসে এই গুরুদায়িত্ব নেবেন জিজ্ঞাসা করলে সুপ্রিয়া উত্তর দেন :

''আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা-সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে।
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।''

বৌদ্ধ কাহিনি অবলম্বন করলেও কবিপ্রতিভার স্পর্শে 'নগরলক্ষ্মী' কবিতাটি অনেকাংশে মৌলিক সৃষ্টির তাৎপর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বৌদ্ধ মহাবস্তুবদানের কাহিনি নিয়ে রচিত 'পরিশোধ' কবিতাটি পরবর্তী কালে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে রূপান্তর লাভ করে। মূল বৌদ্ধ কাহিনির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পরিশোধ' কবিতার তুলনা করলে দেখা যায়, মূল কাহিনির অনেক অংশই এখানে বর্জিত হয়েছে। দর্শনমাত্র বজ্রসেনের প্রতি শ্যামার চিত্তে প্রণয়সঞ্চার, সেই প্রণয়কে চরিতার্থ করার জন্য অপর এক প্রণয়ীর প্রাণসংহার এবং শ্যামার কবল থেকে বজ্রসেনের আত্ম-পরিত্রাণ—রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পরিশোধ' কবিতায় মূল কাহিনি থেকে এই কয়টি অংশই মুখ্যভাবে গ্রহণ করেছেন। প্রথম দর্শনেই এই প্রণয়সঞ্চার যে চটুলতা নয়, কেবলমাত্র রূপতৃষ্ণাসঞ্জাত 'চক্ষুরাগ' নয়, এ যে জন্মজন্মান্তরের বাসনাসঞ্জাত, 'পরিশোধ' কবিতায় একথা দ্বিধাহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে। মূল জাতকে যা ছিল ইঙ্গিতমাত্র, রবীন্দ্রনাথ তাকেই স্পষ্টরূপ দান করেছেন। 'পরিশোধ' কবিতার মূল সুরটি শ্যামার কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

''হায় গো বিদেশী পান্থ, কৌতুক এ নহে,
আমার অঙ্গেতে যত স্বর্ণ-অলংকার
সমস্ত সঁপিয়া দিয়া শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে; তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।''

এই গভীর প্রেমানুভবের বাণীই মূর্ত হয়ে উঠেছে 'পরিশোধ' কবিতায়। এখানে বৌদ্ধ জাতকের কাহিনিকে কবি যেভাবে রূপান্তরিত করেছেন, তাতে স্থূল ইন্দ্রিয়কামনা দূর হয়ে গেছে, প্রকাশ পেয়েছে প্রেমের গভীরতা। জাতকের বজ্রসেন চরিত্রের মধ্যে একটা ভীরুতা লক্ষ করা যায়। সে শ্যামার কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে শুধু প্রাণভয়ে ভীত হয়ে। পূর্বতন শ্রেষ্ঠিপুত্রের ভাগ্যে যা ঘটেছে নিজের সম্বন্ধেও তাই আশঙ্কা করে সে আত্মত্রাণের জন্য হীন কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করেছে, জলক্রীড়ার ছলে শ্যামাকে প্রভূত মদ্যপান করিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। এর মধ্যে পৌরুষ ও বীর্য নেই। শ্যামার চরিত্রের প্রতি বিতৃষ্ণা এর মূল কারণ নয়। কিন্তু 'পরিশোধ' কবিতায় বজ্রসেন যে শ্যামার সঙ্গ পরিত্যাগ করবার জন্য তৎপর হয়েছে, তার কারণ শ্যামার চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। যাকে সে চন্দনলতা বলে আলিঙ্গন করেছিল তা যে প্রকৃতপক্ষে বিষবল্লী ভিন্ন আর কিছুই নয়—এই আকস্মিক উপলব্ধির সঙ্গে ভীরু পলায়নী বৃত্তির বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। তাই শ্যামার প্রতি বজ্রসেনের নৃশংসতার মধ্যেও একটা উদাত্ত পৌরুষ বিরাজমান। সর্বপ্রকার নীচতার বিরুদ্ধে আন্তরিক গ্লানি ও পুরুষোচিত বীর্য বজ্রসেন চরিত্রকে মহৎ করে তুলেছে। 'পরিশোধ' কবিতার অবসানে শ্যামা ও বজ্রসেনের বিচ্ছেদদৃশ্য তাই এক অপূর্ব বেদনায়

মণ্ডিত হয়ে উঠেছে :

''... মুদি দুই আঁখি
কহিল ফিরায়ে মুখ, 'যাও যাও ফিরে,
মোরে ছেড়ে চলে যাও!' নারী নতশিরে
ক্ষণতরে রহিল নীরবে। পরক্ষণে
ভূতলে রাখিয়া জানু যুবার চরণে
প্রণমিল, তার পরে নামি নদীতীরে
আঁধার বনের পথে চলি গেল ধীরে,
নিদ্রাভঙ্গে ক্ষণিকের অপূর্ব স্বপন
নিশার তিমির-মাঝে মিলায় যেমন।''

নীতিধর্মে, আদর্শে ও উপলব্ধিতে 'পরিশোধ' কবিতাকে যখন কবি 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেছেন তখন যে-সূক্ষ্ম ও তাৎপর্যময় পরিবর্তন সাধন করেছেন তাতে সেটি এক নূতন সৃষ্টির মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'কথা' কাব্যের অন্তর্গত 'সামান্য ক্ষতি' কবিতাটির মূল উৎস 'দিব্যাবদানমালা'-র অন্তর্গত শ্যামাবতীর কাহিনি। মূল বৌদ্ধ কাহিনির কাঠামোটুকু শুধু কবি গ্রহণ করেছেন। কবিতাটি শুরু হয়েছে এক নাটকীয় আভাসের মধ্য দিয়ে :

''বহে মাঘমাসে শীতের বাতাস,
স্বচ্ছসলিলা বরুণা।
পুরী হতে দূরে গ্রামে নির্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পকবনে,
স্নানে চলেছেন শতসখীসনে
কাশীর মহিষী করুণা।''

বৌদ্ধ কাহিনির শ্যামাবতী রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মহিষী করুণায় রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর এক প্রহরের লীলায় দরিদ্র প্রজাদের কুটিরগুলি লেলিহান অগ্নিশিখায় নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বৌদ্ধ কাহিনিতে শুধুমাত্র সাধুর কুটিরটি ভস্মীভূত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দরিদ্র প্রজাদের ছোট গ্রামখানি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। রানির এই নির্মম কার্যের বিচারে কাশীরাজ তাঁকে

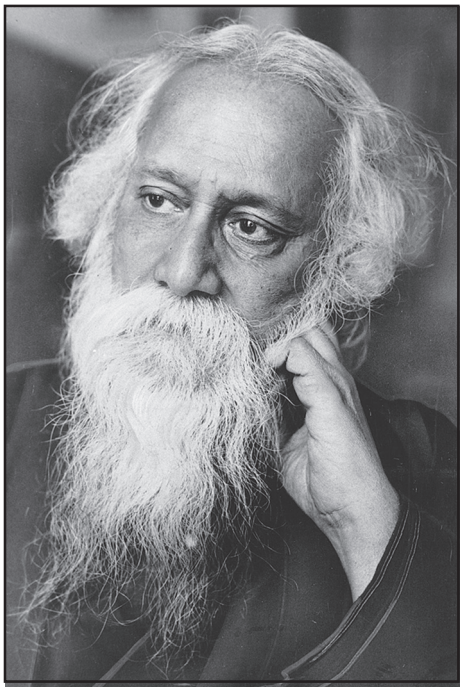

ভিখারিনির বেশ পরিয়ে আদেশ দিলেন দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে কুটিরগুলি তৈরি করে দেওয়ার। শুধু তাই নয়, এক বছর পরে রানি যেন করজোড়ে রাজদরবারে এসে জানান জীর্ণ কুটিরগুলি নাশ করে জগতের কতটুকু ক্ষতি হয়েছে। বৌদ্ধ যুগের রাজধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতার এক সুন্দর চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে।

অবদানশতকে প্রাপ্ত বৌদ্ধকাহিনির নির্যাসটুকু গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন 'মূল্যপ্রাপ্তি' কবিতাটি। এই কবিতায় সুদাস মালি তার 'কাননের সরোবরে' প্রস্ফুটিত অকালের পদ্মফুলটি বহু মাষা স্বর্ণের বিনিময়েও বিক্রি না করে চলেছে প্রভু বুদ্ধের চরণে উৎসর্গ করতে। ভগবান বুদ্ধের শান্ত-সমাহিত করুণাঘন মূর্তিটি কবি অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। জেতবন উজ্জ্বল করে বুদ্ধদেব বিরাজ করছেন :

''বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে,

নিরঞ্জন আনন্দমুরতি।
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর-'পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।"

ব্যাকুল সুদাস পরম আগ্রহে 'প্রভুর চরণপদ্ম-'পরে' নিবেদন করে তার ফুল। তখন :

"বরষি অমৃতরাশি বুদ্ধ শুধালেন হাসি,
'কহো বৎস, কী তব প্রার্থনা।'
ব্যাকুল সুদাস কহে, 'প্রভু, আর কিছু নহে,
চরণের ধূলি এক কণা।' "

ভক্তির আলোকে ভক্ত ও ভগবানের নিগূঢ় সম্পর্কের রূপটি কবি এখানে অপার মহিমায় মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন।

সুদাস মালি চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের নূতন সৃষ্টি। একইসঙ্গে উচ্চ ত্যাগাদর্শে ও আন্তরিক আত্মসমর্পণে সুদাস মালির চরিত্রটি ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

'অভিসার' কবিতাটির মূল 'বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা' বলে কবি নির্দেশ করেছেন। কাশ্মীরি কবি ক্ষেমেন্দ্রের উপগুপ্ত-অবদানের মূল কাহিনির কাঠামো অবলম্বনে রবীন্দ্রপ্রতিভার বিস্ময়কর জাদু সন্ন্যাসী উপগুপ্ত ও বাসবদত্তার চরিত্র সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ 'অভিসার' কবিতায় মূল উপাখ্যানের বহু পরিবর্তন সাধন করেছেন ও বৈচিত্র্য এনেছেন। কবিতাটির শুরু হয়েছে এইভাবে :

"সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন সুপ্ত—"।

রূপের পসরা নিয়ে যৌবনমদে মত্তা নগরীর নটী চলেছে অভিসারে। পথে নবীন গৌরকান্তি তরুণ সন্ন্যাসী উপগুপ্তকে সে ললিতকণ্ঠে তার বিলাসকুঞ্জে আমন্ত্রণ জানায়। রবীন্দ্রনাথ উপগুপ্ত ও বাসবদত্তার প্রথম সাক্ষাৎকারের মধ্যে আকস্মিকতা ও নাটকীয়তার সঞ্চার করে ঘটনাটিকে রহস্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। দূতী মারফত নয়, শ্রাবণ-নিশীথিনীর গগনতলে ক্ষীণ প্রদীপালোকে অভিসার-সজ্জিতা বাসবদত্তা স্বয়ং উপগুপ্তের কাছে আপন হৃদয় ব্যক্ত করেছে :

"কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে,
নয়নে জড়িত লজ্জা,
'ক্ষমা করো মোরে কুমার কিশোর,
দয়া কর যদি গৃহে চলো মোর,
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর
এ নহে তোমার শয্যা।' "

কিন্তু এ-আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে করুণ কণ্ঠে সন্ন্যাসী জবাব দিয়েছেন :

"সময় যেদিন আসিবে আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে।"

উপগুপ্তের সঙ্গে বাসবদত্তার প্রথম দর্শন যেমন আকস্মিক, মৃত্যুপথযাত্রিণী বাসবদত্তার সঙ্গে অন্তিম সাক্ষাৎও সেইরকম আকস্মিক। এবারে উতলা চৈত্রসন্ধ্যায় সন্ন্যাসী একা নির্জন পথে চলেছেন। বাসবদত্তা আজ নগরীর বাইরে পরিত্যক্ত। মথুরাবাসীগণ আজ তার সঙ্গ পরিত্যাগ করেছে বটে, কিন্তু অন্য কারণে :

"নিদারুণ রোগে মারীগুটিকায়
ভরে গেছে তার অঙ্গ—
রোগমসীঢালা কালী তনু তার
লয়ে প্রজাগণে পুরপরিখার
বাহিরে ফেলেছে, করি' পরিহার
বিষাক্ত তার সঙ্গ।"

উপগুপ্ত বাসবদত্তার রোগশীর্ণ দেহ নিজ অঙ্কে তুলে নিয়ে তার শুষ্ক অধরে জল ঢেলে দিলেন। 'শীতচন্দনপঙ্কে' লিপ্ত করে দিলেন বাসবদত্তার দেহ। আজ আবার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত, কোকিল-কূজিত, পুষ্পসৌরভ-বাসিত রজনীতে অসীম গগনতলে উপগুপ্তের সঙ্গে বাসবদত্তার সাক্ষাৎ ঘটল :

" 'কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়'
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়—

'আজি রজনীতে হয়েছে সময়,
এসেছি বাসবদত্তা!' "

'অভিসার' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ অবদানের উপগুপ্তের কাহিনি অবলম্বন করলেও কবির গভীর অনুভূতি, জীবনদর্শন এবং প্রেমভাবনার প্রভাবে রূপান্তরিত হয়ে 'অভিসার' কবিতা তথা সন্ন্যাসী উপগুপ্তের চরিত্র সর্বতোভাবেই রবীন্দ্রসৃষ্ট এক অপূর্ব কাব্যকর্ম হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের ত্যাগনিষ্ঠ ভিক্ষু উপগুপ্ত এবং আনন্দ চরিত্র ক্ষমাসুন্দর তথাগত বুদ্ধচরিত্রের স্নিগ্ধ বিভাতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শুধু 'কথা' কাব্যের কাহিনিমূলক কবিতাগুলিই নয়, আরও বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন কবিতায় কবি বুদ্ধদেবকে স্মরণ করেছেন। কবির উপলব্ধিতে ধরা পড়েছিল, কঠোর তপস্যা দিয়েই বুদ্ধ আপনাকে গড়ে তুলেছিলেন। দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন নয়, অন্তরের সংযমসাধনই সেই তপস্যা। সেই সাধনাই তাঁর চরিত্রকে ত্যাগে কঠোর অথচ করুণায় কোমল করে তুলেছিল। তাই খাদ্যহারা মানবের বেদনায় যে-আঁখিদুটি সন্ধ্যাতারার মতো ফুটে থাকে, তাঁরই উদ্দেশে কবি তাঁর প্রণাম নিবেদন করেছেন।

যে-কোনও myth বা পৌরাণিক কাহিনিকে রবীন্দ্রনাথ নৈতিকতায়, মহত্ত্বে, বিশুদ্ধতায় দীপ্ত করে তুলতে পারতেন। বৌদ্ধ জাতকের কাহিনিগুলিও এইভাবে কবিপ্রতিভার 'পরশমণি'র ছোঁয়ায় সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি ও আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। বৌদ্ধ অবদানে যা শুধুমাত্র সাধারণ কাহিনিরূপে বর্ণিত হয়েছে তাকে অবলম্বন করেই রবীন্দ্রপ্রতিভার বিস্ময়কর ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে অসামান্য সব জীবনদর্শনের গাথা-কবিতা। অপরদিকে কবির অনন্যসাধারণ চিত্রনির্মাণ-কুশলতায় ফুটে উঠেছে এক-একটি অনবদ্য চিত্রসম্ভার।

পরিশেষে বলা যায়, 'কথা' কাব্যের বৌদ্ধ আখ্যানমূলক কবিতাগুলি পাঠ করলে বৌদ্ধ ভাবধারা ও বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সে-যুগের একটি ভৌগোলিক চিত্রও আমাদের মানসপটে জেগে ওঠে। শ্রাবস্তীর গগন-লগন প্রাসাদ ও অনাথপিণ্ডদ শ্রেষ্ঠীর জেতবন বিহার, গৃধ্রকূট পর্বতের পাদদেশে বিম্বিসারের প্রাসাদকাননের স্তূপ, বরুণার তীরে ব্রহ্মদত্তের রাজধানী এবং মথুরাপুরীর হর্ম্যরাজি প্রভৃতি অজস্র চিত্ররাশি কবির সৃষ্টিনৈপুণ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অপরদিকে এই কবিতাগুলির সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে ভগবান বুদ্ধের কল্যাণসুন্দর দীপ্তি। ত্যাগে-প্রেমে-সেবায়-ভক্তিতে সে-যুগের যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহৎ আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে, তা যেন ভগবান বুদ্ধের অম্লান দীপ্তি থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি। ✠

তথ্যসূত্র

১। *রবীন্দ্ররচনাবলী* (১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী : কলকাতা, ১৩৯৮), খণ্ড ১৪, সাহিত্যের স্বরূপ' (প্রবন্ধ : 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা'), পৃঃ ১৯৯-২০০

২। *'ছিন্নপত্রাবলী'*, 'ছিন্নপত্র' পত্র ৮৬, (বিশ্বভারতী, ১৪১৮), পৃঃ১৫২-১৫৩

৩। *রবীন্দ্ররচনাবলী*, খণ্ড ১৪, 'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৫, পৃঃ১৭২